# নব্য মুরজিয়া!

# নব্য মুরজিয়া!

শায়খ বকর আবু জায়েদ রহঃ এবং শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ

পূর্বের ও এখনকার সময়ের মুরজিয়াদের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহঃ

মুরজিয়ারা তিন ধরনেরঃ

১. যারা ঈমান ও ক্বদরের ব্যাপারে ক্বাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলাহদের মত ইরজা পোষন করে,
২. যারা জাহমিয়্যাহদের মত ঈমানে ইরজা ও আমলে জবর পোষন করে (যেমনঃ মানুষের কোন ইচ্ছাশক্তি নাই, তাকে তার কৃতকর্ম করতে বাধ্য করা হয়)
৩. তৃতীয় শ্রেনী জাবারিয়্যাহ ও ক্বাদারিয়্যাহদের থেকে ভিন্নতর। এদের বহু শ্রেনীবিভাগ রয়েছেঃ ইউনিসিয়্যাহ, গাসসানিয়্যাহ, সাওবানিয়্যাহ, তুমনিয়্যাহ এবং মুরিসিয়্যাহ ইত্যাদি।

মুরজিয়াদেরকে মুরজিয়া বলা হয় কারণ তারা আমলকে ঈমানের পেছনে ফেলে দেয়। ইরজা শব্দের অর্থ দেরি করা, পেছনে পড়া।

ঈমান নিয়ে যেসব মুরজিয়া কথা বলে তারা দুই ধরনেরঃ
১. চরমপন্থী মুরজিয়া (আল মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুন)
২. ফক্বীহ মুরজিয়া (মুরজিয়াত আল ফুক্বাহা)

১. আল মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনঃ

জাহম বিন সাফওয়ান এবং তার অনুসারীরা বলতঃ ঈমান হল সেটাই যা অন্তরে জানা হয়েছে ও সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। তারা অন্তরের কোন কাজকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত মনে করত না। নাউযুবিল্লাহ,

তারা ভাবত যে একজন মানুষ পূর্ণ মুমিন থাকবে এমনকি যদি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল(স) কে অভিশাপ দেয়, আল্লাহর আউলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আল্লাহর শত্রুদের সমর্থন করে, মসজিদসমূহ ধ্বংস করে, কুরআন ও মুসলিমদের অসম্মান করে, কুফফারদের সাথে মিষ্টতাময় আচরণ করে ইত্যাদি।

তারা বলত যে, এসব হল গুনাহ এবং এগুলো অন্তরের ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না।

যদি তাদের কাছে কুরআন, সুন্নাহ বা ইজমা থেকে কোন দলিল পেশ করে বলা হত যে এসকল কাজ করলে একজন লোক কাফির হয়ে যায়, তবে তারা বলত যে এই কাজগুলোর পেছনে অন্তরের সম্মতি বা জ্ঞান কোনটাই নেই।

তাদের মতে কুফর হওয়ার শুধু একটাই কারণ ছিল - অজ্ঞতা। আর ঈমান বলতেও একটা জিনিসই ছিল, জ্ঞান, অর্থাৎ অন্তরে তাগুত বর্জন ও আল্লাহকে গ্রহণের স্বীকৃতি।

অন্তরের সম্মতিজ্ঞাপন আর জ্ঞান কি একই বস্ত কি না এই ব্যাপারে তাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাদের দেয়া ঈমানের সংজ্ঞা জঘন্যতম হওয়া সত্ত্বেও বহু মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনা (চরমপন্থী মুরজিয়া) একে গ্রহণ করে।

সালাফদের মধ্যে অনেকেই (ওয়াকি ইবনুল জাররাহ, আহমাদ ইবন হাম্বাল, আবি আবাইদ ও অন্যান্যরা) মুরজিয়া আল মুতাকাল্লিমুনের ধারায় ঈমানের এধরনের সংজ্ঞা প্রদানকারীদেরকে কাফির হিসেবে গণ্য করতেন।

এই আলেমগণ বলেছেন যে, কুরআনের ভাষ্যমতে শয়তান কাফির। শয়তানের কুফর তার ঔদ্ধত্যের কারণে, আদমকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে। এজন্যে নয় যে সে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছে। ফিরাউন ও তার লোকেদের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেনঃ

"তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? "
[২৭:১৪]

ফিরাউনকে মুসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেনঃ

"তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাযিল করেছেন।"
[১৭:১০২]

সত্য নবী মুসা (আ) ফিরাউনকে যে কথাটি বললেন তা প্রমাণ করে দেয় যে ফিরাউন আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল কিন্তু তবুও সে সর্বাপেক্ষা একরোখা ও সীমা অতিক্রমকারীদের একজন ছিল। তার কলুষিত মনোবাসনাই এর কারণ, জ্ঞানের স্বল্পতা নয়।

আল্লাহ্ বলেনঃ

“ফিরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দূর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী।”
[২৮:৪]

ইহুদিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলেনঃ

“আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।”
[২:১৪৬]

এবং মুশরিকদের ক্ষেত্রেঃ

“তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে।”
[৬:৩৩]

২. মুরজিয়া আল ফুক্বাহাঃ

মুরজিয়া আল ফুক্বাহা হল তারা যারা বলে যে ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি ও জিহ্বার উচ্চারণ। তারা আমলকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না। মুরজিয়া আল ফুক্বাহারা কুফাতে ফক্বীহ ও আবেদ হিসেবে পরিচিত ছিল।

তারা স্বীকার করতো যে ঈমানের শাহাদাত বাণী উচ্চারন করা ব্যতীত কোন ব্যক্তি মুসলিম হতে পারে না, কিন্তু জাহম বিন সাফওয়ান মনে করত যে এই সাক্ষ্যদান ছাড়াও মানুষ মুসলিম হতে পারে। মুরজিয়া আল ফুক্বাহা শয়তান, ফিরাউন ও অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে বিশ্বাস করতো যে, তারা অন্তরে জানত যে নবীগণ সত্য প্রচার করছেন।
কিন্ত মুরজিয়া আল ফুক্বাহা স্বীকার করতো না যে আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তাদের তর্ক জাহম বিন সাফওয়ানের মতই অসাড়। আমলের কারণে ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে - মুরজিয়া আল ফুক্বাহা এটা অস্বীকার করতো। মুরজিয়া আল ফুক্বাহা বিশ্বাস করতো যে, সকল আয়াত অবতীর্ণ হবার আগে ঈমানের বৃদ্ধি ঘটতো।

কারণ যখনই আল্লাহ একটা নতুন আয়াত অবতীর্ণ করতেন তখন এই আয়াতকে স্বীকৃতিদান (তাসদীক) পূর্বের আয়াতগুলোর প্রতি আনীত ঈমানের সাথে মিলিত হয়ে ঈমানকে বৃদ্ধি করতো।

কিন্ত কুরআন নাযিল সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর ঈমানের বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হওয়ার পরবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে তারা বলত যে সকল মুসলিমের ঈমান একই সমান। প্রথম যামানার আবু বকর বা উমার রাদিঃ দের ঈমান এবং হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, আবু মুসলিম আল খোরাসানির মত অবাধ্য লোকের ঈমান একই সমান।

আমাদের সময়ে ইরজাঃ

আমাদের সময়ে সাধারণ মুসলিম এবং ইসলামের জন্যে কাজ করে যাওয়া দাঈদের মাঝে ইরজা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

সাধারণ মুসলিমদের ইরজার বিষয়টি সুপরিচিত; ঈমান অন্তরে থাকে, তারা তাদের আমলের উপর গুরুত্ব দেয় না বরং দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলকে খাট ও অবহেলা করে এবং বলে যে অন্তরের ঈমান ও পরিশুদ্ধ নিয়্যাতই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

লক্ষণীয় যে, বর্তমানে ইসলামের জন্যে যারা কাজ করেন সেসব দাঈদের ইরজা ঈমানের সংজ্ঞাতে নয়। তারা ঈমানের খুব সুন্দর সংজ্ঞা দিতে জানেন। তারা বলেন, ঈমান হচ্ছে জিহ্বার উচ্চারণ, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল। তারা আরো বলেন, কথা ও কর্মের দ্বারা ঈমান গঠিত। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে এটিই ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা।

কিন্ত যখনই এই সংজ্ঞাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার বিষয়টি আসে, বিশেষ করে সেসব বিষয় যা ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়, তখন স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তারা আর সংজ্ঞাকে মানছেন না।

তাদের অধিকাংশই বলেন যে ঈমান ভাল কাজের দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং খারাপ কাজের দ্বারা হ্রাস পায়; ঠিক যেমনটি আহলুস সুন্নাহ বলে থাকে।

কিন্তু ঈমান বিধ্বংসী গুনাহগুলো তাদের দৃষ্টিতে শুধু ঈমানকে কমিয়ে দেয়, কখনোই ঈমানকে বিনষ্ট করে না শুধু একটা ক্ষেত্র ব্যতীত। আর তা হল অস্বীকৃতি জানানো, ইসতিহলাল অথবা অন্তরের বিশ্বাস, এবার গুনাহ বা আমল যতই বড় হউক না কেন। তারা বলে, যদিও রাসুল(স) বলেছেনঃ

“ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা আছে। সবচেয়ে উত্তম শাখা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃত দেয়া এবং নিম্নতম শাখা হল রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্ত সরানো। লজ্জা ঈমানের অংশ। ”

[মুসলিম]

ঈমানের সকল শাখা সমান নয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শাখা কখনোই লজ্জা বা রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরানোর সমান নয়।

এধরনের কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে কমিয়ে দিতে পারে, যেমন লজ্জা। আর কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতি দানের অনুপস্থিতি।
খাওয়ারিজ ও তাদের অনুসারী চরমপন্থী তাকফিরি দলের লোকেরা এই শাখার যে কোন একটির অনুপস্থিতিকে ঈমান বিনষ্টকারী হিসেবে গণ্য করে।

অপরপক্ষে, নব্য মুরজিয়ারা বলে যে, সকল শাখার অনুপস্থিতি থাকলেও একজনের ঈমান শুধু হ্রাস পায় মাত্র।

তারা এই শাখারগুলোর কোনটির অনুপস্থিতিকেই ঈমান বিধ্বংসী মনে করে না, শুধুমাত্র 'ইসতিহলাল ও জুহুদ' বা বিশ্বাসের ক্ষেত্র ছাড়া। খাওয়ারিজ ও নব্য মুরজিয়া উভয়েই বাড়াবাড়ি আর ছাড়াছাড়ির কারণে গোমরাহীর উপর আছে।
ঈমান ও কুফর সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহর অবস্থানঃ

সত্য পথের লোকেরা, নাজাতপ্রাপ্ত ফিরকার সদস্যরা এবং তায়েফাহ আল মানসুরার অন্তর্ভুক্তরা ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে মধ্যমপন্থার অনুসারী।

প্রথমত, তাদের মতে ঈমানের কিছু শাখার অনুপস্থিতি ঈমানকে দূর্বল করে দেয় কিন্তু পুরোপুরি নষ্ট করে না। এমন শাখাগুলোর দুটি ভাগ আছে-
□ যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে মুস্তাহাব
□ যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে ওয়াজিব

দ্বিতীয়ত, কিছু শাখা আছে যার অনুপস্থিতি ঈমানকে পুরোপুরি বিনষ্ট করে দেয়।
সুতরাং, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর দৃষ্টিতে ঈমানের শাখাগুলো মোট তিন ধরনেরঃ

☐ যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে মুস্তাহাব,
☐ যে শাখাগুলো ঈমানের পূর্ণতার জন্যে ওয়াজিব এবং
☐ যে শাখাগুলো ছাড়া ঈমান বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়।

আহলুস সুন্নাহর লোকেরা কোন আমলকে কুরআন বা সুন্নাহর দলিল ব্যতীত এই তিন শ্রেণির কোন শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত করেন না।

“ তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিখিয়েছ (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। ”
[২:৩২]

নব্য মুরজিয়াদের সাথে ঈমান ও কুফরের ধারণায় সবচেয়ে মিল পাওয়া যায় বাগদাদের মুরিসিয়্যাহ মুরজিয়াদের।

মুরিসিয়্যাহরা বিশর বিন গাইয়্যাস আল মুরিসি এর অনুসারী। সে বলত যে, ঈমান হচ্ছে অন্তরের স্বীকৃতি ও জিহ্বার উচ্চারণের সমন্বয়, আর কুফর হল অস্বীকার করা ও প্রত্যাখান করা। তাই তারা বলত যে কোন মূর্তির সামনে সিজদা করা কুফর নয়, কুফরের চিহ্ন মাত্র।

নব্য মুরজিয়ারা কোন আমলকেই ইসলাম বিনষ্টকারী মনে করে না। তারা বলে যে এর পেছনে ইসতিহলাল, জুহুদ বা দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। তাদের মতে এটিই হল কুফর।

আল্লাহকে অভিশাপ দেয়া, মূর্তির সামনে সিজদা দেয়া, আল্লাহর সম্পূর্ণ আইন থাকবার পরও নতুন করে আইন প্রণয়ন করা, আল্লাহর দ্বীনকে নিয়ে ঠাট্টা করা - এসব কাজের কোনটাই কুফর নয় কিন্তু এই কাজগুলোর মাধ্যমে বুঝা যায় না যে কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার কুফরী কাজে বিশ্বাস করে।

কুফর তো হল তার বিশ্বাস, তার অস্বীকৃতি অথবা তার ইসতিহলাল (কাজটি স্বয়ং নয়)।

এভাবে নব্য মুরজিয়ারা মুসলিমদের জন্যে ভয়াবহ এক ক্ষতির দরজা খুলে দিয়েছে। বহু কাফির, নাস্তিক, মুনাফিক এবং যিন্দিক আল্লাহর দ্বীনকে আরামসে আক্রমণ করছে। নব্য মুরজিয়ারা তাগুত ও মুরতাদদের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করায়।

তারা তাগুত ও মুরতাদদের পক্ষ নিয়ে বলে যে তাগুতরা কখনই অন্তর দিয়ে এসব ব্যাপারে ভাবেনি। তাই দেখা যায় তাগুতরা নিজেদের বাঁচাতে এইসমস্ত নব্য মুরজিয়াদের মত অনুগত সৈন্য খুব কমই পেয়েছে।

এজন্যেই সালাফদের অনেকে ইরজা সম্পর্কে বলেছেনঃ

এই ধর্ম রাজাদের খুশি করে।

অনেকে বলেছেনঃ আমরা মুরজিয়াদের ফিতনাকে খাওয়ারিজদের ফিতনা অপেক্ষা বেশি ভয় করি। তারা বলতেন যে খাওয়ারিজরা মুরজিয়াদের চেয়ে কম খারাপ এবং এটা আসলেই সত্য।

কেননা খাওয়ারিজদের চরমপন্থার প্রাথমিক কারণ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমার প্রতি তাদের জেদী মনোভাব।

আর মুরজিয়াদের তরিকা মুসলিমদেরকে আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘনের জন্যে উৎসাহিত করে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে শেখায় এবং কাফের মুশরিকদের জন্যে তাদের খারাপ কাজকে সোজা করে দিয়ে রিদ্দার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।